বঙ্গবন্ধু

ও ক'জন ঘনিষ্ঠ সুহৃদ

ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী

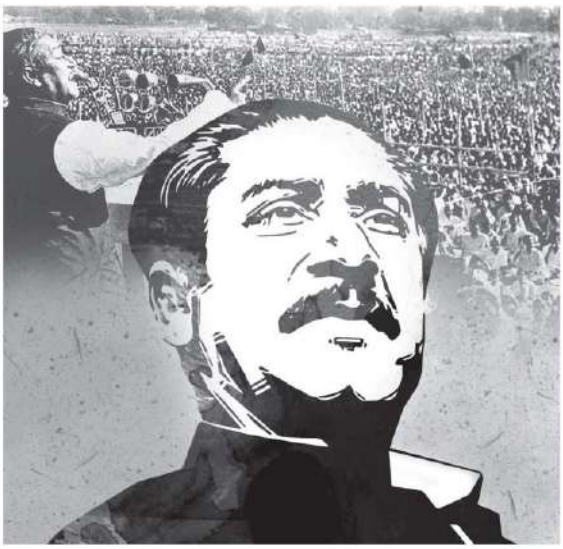

অবসর

প্রাক্‌কথন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। বাঙালির কিংবদন্তি এই মহান ব্যক্তিকে নিয়ে আরও অনেক কথা বলার রয়েছে বলে বিজ্ঞজনেরা মনে করেন।

বঙ্গবন্ধুর পদচারণার ক্ষেত্র ছিল বহু-বিস্তৃত। রাজনৈতিক সহকর্মী, গুণগ্রাহী, স্বজন, সুহৃদ ও হিতাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা অন্তহীন। দেশ পেরিয়ে, আন্তর্জাতিক বিশ্বেও তা বিস্তৃত। এঁদের সকলের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে যদি বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কের বিষয়গুলো তুলে আনা যায়, হয়তোবা নতুন নতুন পরিচয়ে তাঁকে জানা যাবে। তবে, সঙ্গত কারণে, আমি আমার এ বইয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কিত মাত্র ১৬ জন কৃতবিদ্য ব্যক্তির সম্পর্কের বিষয়ে আলোকপাত করেছি। তবে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, এর বাইরেও অনেকে রয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু গবেষকগণ এদিকে দৃষ্টি দেবেন আশা করি।

'বঙ্গবন্ধু ও ক'জন ঘনিষ্ঠ সুহৃদ' বইটি লেখার পেছনে ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য দফতরে কর্মরত ছিলাম। সেখানে আমার অন্যতম সহকর্মী ছিলেন সাংবাদিক বেবী মওদুদ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহপাঠী)। বয়সে বড় হওয়ায়, বেবী মওদুদকে বোন বলে সম্বোধন করতাম, তিনিও আমাকে ছোট্ট ভাইয়ের মতো দেখতেন। একদিন বেবী আপার হাতে দেখলাম খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের 'মুজিববাদ' বইটি। লেখকের গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জের কড়িপাড়া গ্রামে আমি এক আত্মীয়ের সঙ্গে বেড়াতে গেছি। তাঁর বাড়িটাও দেখেছি। অদম্য কৌতূহল হলো বইটি পড়ার। বেবী আপা বললেন, 'পড়তে চাও নিয়ে যাও।' বড় বই, দিন দশেক পড়তে লাগলো। বইটি পড়ার পর 'মুজিববাদ ও খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস' নামে একটি লেখা তৈরি করি। পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য হাতে লিখেই 'প্রেস কপি' বানিয়ে নিই। পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশের ইচ্ছে ব্যক্ত করায় বেবী আপা

আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'খবরদার এখন এ লেখা প্রকাশ করো না, চাকরি চলে যাবে।' আমি লেখাটি রেখে দিয়েছিলাম। প্রায় ৪৫ বছর পর ওই লেখাটিই একটু আঙ্গিক বদল করে এই পাণ্ডুলিপিতে যুক্ত হলো।

বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে রাজনৈতিক অঙ্গনের বঙ্গবন্ধুর বয়োজ্যেষ্ঠ ও সমসাময়িক রাজনীতিবিদ—মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, শামসুল হক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান সম্পর্কে আলোচনা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজনীতিক ও সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এবং খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন নেতা, অপরদিকে তিনি সাংবাদিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন 'ছোলতান', 'মোহাম্মদী', 'দি মুসলমান' পত্রিকায় কাজ করেন। সাংবাদিক হিসেবে তার সর্বাধিক পরিচিতি বয়ে আনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর 'ইত্তেহাদ' পত্রিকা সম্পাদনা করে। তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) সাংবাদিক হিসেবে বিশেষ যশস্বী হয়েছিলেন বস্তুত 'ইত্তেফাক' পত্রিকা সম্পাদনা করে। তবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাহচর্যে থেকে কলকাতাতেই সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ছিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ভাবশিষ্য এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক সহকর্মী। এ কারণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর বিষয়টি আলোচিত হয়। এই অধ্যায়ে আরও আলোচনা করা হয়েছে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস সম্পর্কে, তিনি বিভাগোত্তর কালেই 'আজাদ', 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে সাপ্তাহিক 'যুগের দাবি' পত্রিকা। অপরদিকে ঘনিষ্ঠভাবে রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)'র সঙ্গে। পরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এজন্য পৃথক অধ্যায়ে তাঁকেও রাখা হয়েছে।

তৃতীয় পর্বের সাহিত্য-সংস্কৃতি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জয়নুল আবেদিন, আব্বাস উদ্দীন আহমদ ও জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কের বিষয় আলোচিত হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যাকরণগতসূত্রে বঙ্গবন্ধুর সুহৃদগণের তালিকাভুক্ত করা যায় না। কিন্তু তিনি বঙ্গবন্ধুর সুহৃদ বিবেচিত হয়েছেন, তাঁর অমর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য—গান,

কবিতা ও অন্যান্য লেখার কারণে। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায়, লেখায় বারবার বলেছেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সবচাইতে প্রিয় কবি। পাকিস্তান শাসনামলে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু তা হতে দেননি। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে রবীন্দ্র সাহিত্যের কতোটা ভূমিকা ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না, সকলেরই জানা। এজন্যই সুহৃদ তালিকায় রবীন্দ্রনাথ এসেছেন। অনুরূপ কথা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে বলা যায়। বঙ্গবন্ধু বাঙালির অহঙ্কার এই দুই মনীষীকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে অনেকেই তথ্য দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, বইপত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, নাটোরে কথায় কথায় বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে দুর্লভ কিছু তথ্যের সন্ধান আমাকে দেন—এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তথ্য দিয়ে, বই দিয়ে সহযোগিতা করেছেন—বাংলা একাডেমির অন্যতম পরিচালক, ফোকলোরবিদ ড. আমিনুর রহমান সুলতান, কবি তসিকুল ইসলাম রাজা, কবি রুহুল আমিন প্রামাণিক, কবি আরিফুল হক কুমার, সাংবাদিক হাসান মিল্লাত, লেখক-গবেষক ড. রওশন জাহিদ, অনুবাদক কে এম এ মোমিন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুস সালাম। বেশকিছু আলোকচিত্র ও তথ্য দিয়েছেন—মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল, প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম। লেখালেখির সময় আমাকে সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য দিয়েছে আমার তিন দৌহিত্র, দৌহিত্রী—আহনাফ তাহসিন, আয়ান তাহসিন ও মিনহা তাহসিন। জার্মানি থেকে আমাকে কিছু দুর্লভ তথ্য পাঠিয়েছে আমার পুত্র প্রকৌশলী তৌফিক ইমাম চৌধুরী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভাগ্নে শিল্পী আনোয়ার হোসেন। ধৈর্য নিয়ে পাণ্ডুলিপিটির কম্পিউটটার কম্পোজ করে দিয়েছেন অধ্যাপক মনোয়ার আহম্মেদ সরকার। এদের সকলের কাছে আমি ঋণী।

সাইফুদ্দীন চৌধুরী
তাহমিনা ক্যাসল
বাড়ি-১৯০, সেক্টর-২
হাউজিং এস্টেট উপশহর
রাজশাহী।

সূ চি প ত্র

প্রথম পর্ব : রাজনৈতিক অঙ্গন ১৫-১১৬
আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৭
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৩২
আতাউর রহমান খান ৪৯
শামসুল হক ৫৭
সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৭১
তাজউদ্দীন আহমদ ৮৫
এম মনসুর আলী ৯৫
আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান ১০৮

দ্বিতীয় পর্ব : রাজনৈতিক ও সাংবাদিকতা অঙ্গন ১১৭-১৪৭
আবুল মনসুর আহমদ ১১৯
তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ১২৭
খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ১৩৮

তৃতীয় পর্ব : সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গন ১৪৯-১৮৬
রবীন্দ্রনাথ ১৫১
কাজী নজরুল ইসলাম ১৫৯
আব্বাসউদ্দীন ১৬৫
জয়নুল আবেদিন ১৭১
জসীমউদ্‌দীন ১৭৯

পরিশিষ্ট ১৮৭-২০১
গ্রন্থপঞ্জি ২০২-২০৮

প্রথম পর্ব

রাজনৈতিক অঙ্গন

আবদুল হামিদ খান ভাসানী

শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম রাজনৈতিক গুরু ছিলেন, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বিভিন্ন স্থানে তিনি শেখ মুজিবকে নাতি হিসেবে সম্বোধন করবেন।

আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই ১৯০২ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে, তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী ধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় দশ মাস কারাবন্দি থাকেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯১৯ এ কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশনে যোগ দিয়ে কৃষক-প্রজাদের ওপর জমিদার-মহাজনদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করেন। ১৯৩৪ সালে আসামের স্থানীয় লোকেরা বাঙালিদের বহিষ্কার করার লক্ষ্যে 'বাঙাল খেদা' আন্দোলন শুরু করলে, তিনি তার বিরুদ্ধে আসামের কাগমারী থেকে বিশাল পাল্টা আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ বছরই তিনি আসাম ও কলকাতা ছেড়ে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। ১৯৪৮ এর ফেব্রুয়ারি মাসে টাঙ্গাইলের কাগমারী এলে সবাই তাঁকে অনুরোধ করেন টাঙ্গাইলের দক্ষিণ নির্বাচনী এলাকার উপনির্বাচনে খালি আসনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী খাজা নাজিমুদ্দীন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয়ায় ভাসানী সাহেব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন।

এ বছরের মার্চ মাসে ভাষার দাবিতে ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। হরতালের দিন পুলিশি নির্যাতনে অসংখ্য মানুষ আহত হয়। শেখ মুজিব, শামসুল হক, অলি আহাদসহ ৬৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৭ মার্চ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন ভাসানী সাহেব, সংসদে আলোচনার ভাষা ইংরেজি না করে বাংলা করার জন্য স্পিকারকে অনুরোধ জানান।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩। খালি পায়ে মাওলানা ভাসানীকে নিয়ে শেখ মুজিব শহীদ মিনারের দিকে প্রভাতফেরিতে অংশ নেন

ক'দিন পর টাঙ্গাইলে মুসলিম লীগ কর্মীদের এক সভা আহ্বান করা হয় পার্টির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য। সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ভাসানী সাহেবের সভাপতিত্বে সভা করা হয়। সভায় শেখ মুজিব ও অন্যান্যরা পুরোনো মুসলিম লীগকে কাজ করার সুযোগ দেয়ার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ জানান। সভায় দুজন প্রতিনিধিকে করাচিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ভাসানী সাহেব নির্বাচনী হিসাব দাখিল না করার কারণে, সরকার ওই নির্বাচন বে-আইনি ঘোষণা করে। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ভাসানীসহ ক'জনের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অংশ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। আবার উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত

হয়। ওই উপ-নির্বাচনে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের শামসুল হক, মুসলিম লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে বিজয়ী হন। বলাবাহুল্য 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' সংজ্ঞাগত অর্থে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখের অনুসারী একদল তরুণ কর্মী এই সংগঠন গড়ে তুলেছিল।

শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, নঈমুদ্দিন আহমদ, ফজলুল কাদের চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন এই সংগঠনের

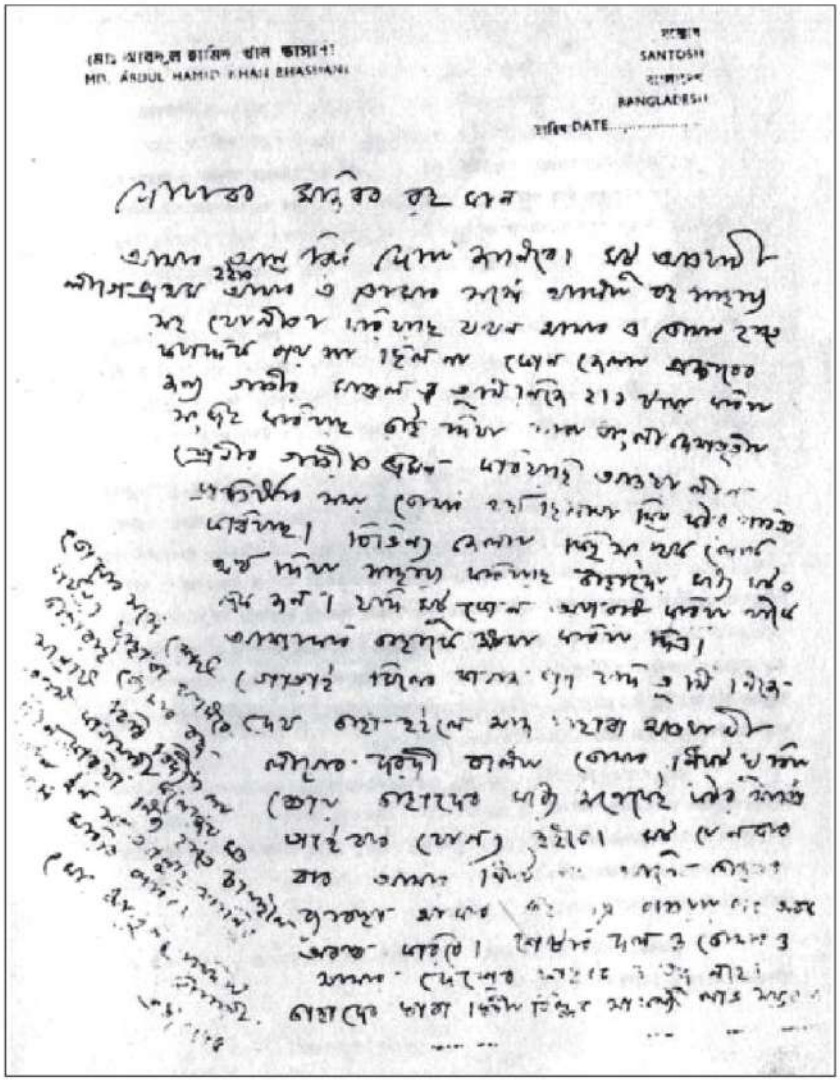

ভাসানীর একটি চিঠি বঙ্গবন্ধুকে

উদ্যোক্তা। টাঙ্গাইল নির্বাচনের পর সরকার জঘন্য পন্থায় ওই নির্বাচন বাতিল করার চেষ্টা করে। শামসুল হকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ওই মামলার সূত্রেই ১৯৪৯ এ মার্চ মাসে আসামের ধুবড়ী থেকে ফিরে এসে মওলানা ভাসানী আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন এবং সারা দেশে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য, এসময় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দায়িত্বে ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীন, মওলানা আকরম খাঁ, নূরুল আমিন, ইউসুফ আলী চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, ঢাকায় হুমায়ুন কবির সাহেবের বাসভবন রোজ-গার্ডেনে। সম্মেলনে, আবদুল

মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব ও মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ

হামিদ খান ভাসানী সভাপতি, শামসুল হককে সেক্রেটারি ও নিরাপত্তা বন্দি শেখ মুজিবকে জয়েন্ট সেক্রেটারি করা হয়। এই কমিটি গঠনের কয়েকদিন পরই জেল থেকে মুক্তি পান শেখ মুজিব। শেখ মুজিব তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

> *জেল গেটে গিয়ে দেখি বিরাট জনতা আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য এসেছে মওলানা ভাসানী সাহেবের নেতৃত্বে। বাহাউদ্দিন আমাকে চুপিচুপি বলে, 'মুজিব ভাই, পূর্বে মুক্তি পেলে একটা মালাও কেউ দিত না, আপনার সাথে মুক্তি পাচ্ছি, একটা মালা তো পাব।' আমি হেসে দিয়ে বললাম,*